নাট্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার

(সূচনাপর্ব থেকে বিশ শতকের সাতের দশক)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি এইচ ডি

উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা

অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

করবী সরদার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখর কুমার সমাদ্দার

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৩২

২০২৪

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ইদানিংকালে তার পুরোনো ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নানা দিকে প্রবাহিত হলেও বাংলার থিয়েটার চর্চার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস এখনো প্রণীত হয় নি। অথচ একমাত্র উপযুক্ত সমালোচনা-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে থিয়েটারের চলমান এবং নিত্য পরিবর্তনশীল রূপের কিছুটা হদিশ আগামী দিনের জন্য তুলে রাখতে পারা সম্ভব, এ কথা আজ জোর দিয়ে বলা যায়। ইতিমধ্যে নাট্য সমালোচনার কিছু সংকলন প্রকাশিত হলেও ধারাবাহিকভাবে এর মাধ্যমে থিয়েটারের স্রোত-প্রতিস্রোতের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় নি। এই গবেষণা সেই চেষ্টার একটি প্রাথমিক উদ্যোগমাত্র।

একথা মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর কোনো দেশেই যেমন শিল্পসৃজনের একটি নির্দিষ্ট রূপ বা রীতি নেই, কেবল প্রবণতা আছে, তেমনি তার সমালোচনারও একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা হয় না। নাটকের তত্ত্বকাঠামো নির্মাণ করা সমালোচকের একটা প্রধান কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় এই তত্ত্বকাঠামো প্রণয়নের কোনো প্রবণতা না সাহিত্যে, না শিল্পে–কোথাও নেই। ফলে এখানে সমালোচনা শব্দের অর্থ ভিন্ন। আমরা আজো পর্যন্ত হয় প্রাচ্য নতুবা পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শ অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পের বিচার করে থাকি। তাই, বাংলা অভিধানও ‘সমালোচনা’ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণে বড়োই কৃপণ। কেউ যদি সৌজন্যবশত ভেবে থাকেন, ‘সমালোচনা’ অর্থ হল ‘সম-আলোচনা’ অথবা ‘সম্যকরূপে আলোচনা’-তাহলে সে সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে অভিধান বলছে- ‘দোষ-গুণের সম্যক বিচার, সাহিত্যশিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিশ্লেষণ’, ‘দোষগুণের আলোচনা বা বিচার’।

খুব সম্প্রতিকালে, যাকে আমরা 'Cultural Studies' বা 'সাংস্কৃতিক পাঠাভ্যাস' বলি, সেখানে নাটক ও দর্শকের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এই বক্তব্যবিন্যাসের পরে প্রথম অধ্যায়ে আমরা নানা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে নাট্যের আলোচনা-পর্যালোচনাকে চারটি বিভাগে বিন্যস্ত করছি- ১) শৌখিন মঞ্চের কাল, ২) ন্যাশনাল থিয়েটার ও গিরিশ-পর্ব, ৩) শিশির-পর্ব, ৪) বাংলা থিয়েটারে রাজনীতি।

আমরা লক্ষ্য করেছি উনিশ শতকে ইংরেজদের সংস্পর্শে নাট্যচর্চা এবং লিয়েবেদেফের প্রচেষ্টার পরে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ৬ অক্টোবর ১৮৩৫-এ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয়। নানা কারণেই এই অভিনয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিনয় প্রসঙ্গে ২২ অক্টোবর ১৮৩৫-এর *হিন্দু পাইয়োনিয়ার*-এর প্রতিবেদনটি এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে আধুনিককালেও এরকম লেখার সন্ধান মেলে না। অন্যান্য বিষয়ে তথ্য জানাবার পরে এই প্রতিবেদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয়ের আলোচনা। *ইংলিশম্যান* পত্রিকা এর পালটা প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে এই অভিনয়ে 'নৈতিকতা'র ও 'শালীনতা'র অভাব লক্ষ করেছিলেন। তখনও বাংলা ভাষায় সাহিত্যের জন্ম হয়নি, কবিতা-উপন্যাস, সবের আবির্ভাব এর বেশকিছু পরের ঘটনা। নবীন বসুর পরে যে বাংলা নাটক অভিনীত হল, ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুয়ারি আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)-এর বাড়িতে বৈদ্য নন্দকুমার রায় অনুদিত 'শকুন্তলা' নাটকের, সেখানে বহুমূল্য অলঙ্কার পরে শরৎচন্দ্র ঘোষ সাজলেন শকুন্তলা। ক্রমশ এই ধরনের অভিনয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দর্শক সমাগমও বাড়ছিল। সঙ্গে বাড়ছিল ব্যয়বাহুল্যও। জানা যাচ্ছে, ওই বছরেরই ২৪ নভেম্বর কালীপ্রসন্ন সিংহের

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ‘বিক্রমোর্বশী’-র অভিনয়ে টিকিট না পেয়ে অনেক ‘অভিজাত’ দর্শক ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শৌখিন নাট্যচর্চার দ্বিতীয় পর্বে অভিনেতাই হয়ে উঠলেন শেষ কথা, তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার বিস্তারেই থিয়েটারের যা কিছু প্রতিপত্তি, অথবা সমালোচনা-নিন্দাও। গিরিশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত এই ধারাই প্রবাহিত হয়েছে। শৌখিন নাট্যের দ্বিতীয় পর্বে থিয়েটারের এই সাবালকত্ব প্রত্যাশিত ছিল না। বাগবাজার অ্যামেচার ক্লাবের ‘সধবার একাদশী’ যথাক্রমে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর-এই ত্রয়ীকে একত্রিত করল। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ‘নিমচাঁদ’-এর চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় আজ পর্যন্ত একটি ‘মিথ’ হয়ে আছে, তাকে অতিক্রমণের আর কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। ন্যাশনাল থিয়েটারের পর্ব পেরিয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন থিয়েটারে তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে শ্রেষ্ঠতম নাট্যশিক্ষক, পতিতা-অভিনেত্রীদের প্রধান আশ্রয়স্থল। প্রথম যুগের তুলনায় এই যুগে নাট্য-সাংবাদিকতার চরিত্র বদলে গেল। এই সময়ে বিস্ময়করভাবে বাংলা সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে নাট্যের খবরাখবর তেমন নেই, দুএকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ[২৪] ছাড়া। যা কিছু আলোচনা সবই *Bengalee*, *The Statesman*, *Indian Daily News* ইত্যাদিতে। এও শিষ্ট সমাজের প্রত্যাখ্যানের চেহারা কিনা বলতে পারি না, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) নিজ উদ্যোগে একাধিক পত্রিকা বার করেন, *সৌরভ* (প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩০২), *রঙ্গালয়* (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯০১), *নাট্যমন্দির* (শ্রাবণ ১৩১৭) ইত্যাদি এবং সেইখানে থিয়েটারের ভিতরের মানুষদের লেখবার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ওঠে।

যে শিষ্ট সমাজের সমর্থন গিরিশচন্দ্র পান নি, শিশিরকুমার প্রথমাবধি পেয়েছেন সেই শিষ্ট শিক্ষিত সমাজের সমর্থন ও পুষ্টি দিয়েছেন। প্রথম থেকেই শিশিরকুমার পেয়েছিলেন সমালোচকদের আনুকুল্য। ‘সীতা’-র পর অবশ্য শিশিরকুমারকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে অনেক। স্টার

থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বার করেছিলেন *রূপ ও রঙ্গ* পত্রিকা। এটি মূলত চলচ্চিত্রের খবরাখবরের জন্য, কিন্তু নাটক বিষয়েও লেখা ছাপা হত। কোনো কোনো সংখ্যায় এদের শিশিরকুমার বিরোধিতা করতে দেখা গেছে কিন্তু তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু *বাঙলা* ছিল ঘোরতর শিশির-সমালোচক, *নবশক্তি* শিশিরকুমারের পক্ষে এবং *বাঙলা* শিশিরকুমারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক নিয়ে ব্যর্থ আমেরিকা ভ্রমণে (১৯৩০)-এর পর ১৯৩১ জুড়ে তীব্র চাপান-উতোর করেছে।

আই পি টি এ ও 'নবান্ন'–বাংলা থিয়েটারের নতুন ধারার সূত্রপাত। মূলত মতাদর্শ ভিত্তিক অপেশাদার এই নাট্যচর্চা থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নাট্যকে তার শৈল্পিক গুণাগুণের বাইরেও তার দেশ-কাল-রাষ্ট্রের প্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়েছে, সুতরাং কেবল নিন্দা-প্রশংসার বাইরে প্রকৃত 'সম-আলোচনা' হয়ে উঠার ইতিহাস এই পর্বেই এসে ঘটতে পারল। 'নবান্ন' শুধু বাংলা থিয়েটারেই নয়, বাংলা থিয়েটার, বাংলা নাটককে মূল্যায়ন ও সমালোচনা করার নতুন মানদণ্ডও নির্মাণ করেছে। আমরা তাই দেখতে পাই বুদ্ধিজীবী সমাজ বিশ্লেষক দর্শকের মতামতে।

'নবান্ন' নাটকের সফলতার পরেও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে ভাঙন দেখা দেয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছু আগে থেকে। সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে ছিল, পার্টির মতাদর্শগত লাইন বদল, শিল্পীর আত্মাভিমান ও মতের সঙ্ঘাত, দেশভাগ ও স্বাধীনতা-কালে শিল্পীদের অবস্থান, পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া ইত্যাদি। এইখান থেকেই শুরু প্রথমে নবনাট্য আন্দোলন, পরে গ্রুপ থিয়েটারের।

প্রথম দফায় ‘নবনাট্য’ কি, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন থিয়েটারের লোকেরাই, হয় নাটককার, নতুবা নির্দেশক বা অভিনেতা। সমালোচক নন। যতদূর মনে হয়, ‘বহুরূপী’-ই এই সংস্থা, যাঁরা পূর্বজদের ঐতিহ্য মেনে তাঁদের সর্ব অর্থে সফল প্রযোজনা ‘রক্তকরবী’-র (১৯৫৪) পরের বছর থেকে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা (বছরে দুটি করে সংখ্যা) প্রকাশ করতে শুরু করলেন, তাঁদের স্ব-নামে, এবং সেই ঐতিহ্য কিছুকাল আগে অবধি, ‘বহুরূপী’ সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবার আগে অবধি অব্যাহত ছিল। সম্প্রতি সমকালীন এক নাট্যসমালোচক পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।

রচনা, প্রযোজনা এবং বিতর্ক – সব দিক থেকেই ‘রক্তকরবী’ নবনাট্য ধারার শ্রেষ্ঠতম উল্লেখযোগ্য নাটক বিবেচনায় আমরা এই নাট্যের সমালোচনা নিয়ে একটু বিশদেই আলোচনা করেছি। পাশাপাশি সমালোচকের চোখে আমরা ‘এল টি জি’ গ্রুপের রবীন্দ্র প্রযোজনাগুলির ব্যর্থতাজনিত সমালোচনার কথাও বলেছি।

‘নবনাট্য’কে তাহলে (অবশ্যই *নবান্ন* - উত্তর গণনাট্যকে এর আওতার বাইরে রাখতে হচ্ছে) ব্যক্তির দক্ষতানির্ভর থিয়েটার থেকে সরে এক সামগ্রিক সমাজ ও সময় সংলগ্ন নাট্য অভিঘাত নির্মাণের ক্ষেত্র বলে মনে করা যেতে পারে। নাট্য আন্দোলনের গোড়ার যুগে পেশা নেশা এক ছিল না, ছিল একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অথবা রাজনীতি-সমাজ-শিল্প সচেতন একটি মতাদর্শ।

তৃতীয় অধ্যায়

এই মতাদর্শের প্রশ্নেই ছয়ের দশকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও রাজনীতিতে নানান স্রোত প্রতিস্রোতের জন্ম। সেই অবস্থাটি চলে সাতের দশক পর্যন্ত। অসাধারণ সব যুগান্তকারী নাট্যনির্মাণের সময় এই দুই দশক, খালেদ চৌধুরি তাপস সেনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্যহীন শিল্পের সন্ধানে রত থেকেছে আমাদের নাট্য। পার্টির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীতেও অনিবার্যভাবে উঠেছে মতের তফাৎ, যেমন ‘আমাদের থিয়েটার কতটুকু রাজনৈতিক’, ‘গ্রামে যাওয়া না যাওয়া’

ইত্যাদি। দুটি প্রবণতা বড়ো করে দেখা দেয় এই সময়ে। একদিকে কলকাতার নামী এবং প্রতিষ্ঠিত দলগুলিতে ভাঙন ধরছে, দল ভেঙে দল তৈরির প্রবণতা বাড়ছে। আর ঠিক এই সময়ে ‘গ্রুপ থিয়েটার’-এই বাক্যবন্ধের জন্ম হল, এমন কি তাত্ত্বিক এবং ইতিহাসগত ভাবে তাকে সজ্ঞায়িত করার চেষ্টাও হল । এর অর্থ দাঁড়াল, যাদের একটি মূলত বামপন্থী অবস্থান আছে, কিন্তু শুধু রাজনীতি নয়, নাট্য শিল্পমানের দিকে ঝোঁক আছে, গণনাট্য নয়, ব্যবসায়িক নয়, যার কর্মীরা স্কুলে কলেজে অফিসে চাকরি বাকরি করে সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার করেন। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে একটি পত্রিকা বেরোবে, যার নামই ‘গ্রুপ থিয়েটার’। অন্যদিকে, আমেরিকার ‘গ্রুপ থিয়েটার’ নামক একটি নাট্যপ্রয়াসের অনুসরণে গড়ে উঠছে ‘গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন’। রাজনৈতিকভাবে এই দলগুলি কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার ঘনিষ্ট বা সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী।

চতুর্থ অধ্যায়

আগের দুই দশকের থেকে এই দশকে যে বদলগুলি ঘটছে, সংক্ষেপে আমরা সেটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। প্রথমত গণনাট্য কৃষক জীবনের যে বাস্তবিক ছবি তুলে আনতে চাইছিল বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে, তা মুখ্যত অপেশাদার হলেও ভয়ানকভাবে জীবননিষ্ট। এর রূপকার বিজন ভট্টাচার্যের কিন্তু গণনাট্যে শেষ অবধি জায়গা হয় নি, কবচকুণ্ডল, ক্যালকাটা থিয়েটার গড়ে তাঁকে নিজের থিয়েটারের খোঁজ চালিয়ে যেতে হয়েছে, সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাবের কাছে তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে পরাস্ত হতে হয়েছে। শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছেড়েছেন, নবনাট্য গড়েছেন, কাজ দিয়ে সেই নাট্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে করতে এগিয়েছেন, পেশাদার হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কেবল প্রযোজনার সর্বস্তরে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, ক্রমশ একা হয়েছেন, বিশেষ করে বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি প্রকল্প বিফল হবার পর। এই পর্বে সরে আসতে হচ্ছে উৎপল দত্তকে, ব্যক্তিগতভাবে তিনিও পেশাদার অভিনেতার সাফল্য পাচ্ছেন। এই পেশাদারিত্ব এবং সর্বক্ষণের

নাট্যকর্মী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সময়ে নানা অস্থিরতা। ক্রমশ এক দিকে গ্রুপ থিয়েটার আরো বেশি করে নিয়মিত থিয়েটারের দিকে যেতে চাইছে, পক্ষান্তরে উত্তর কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে এসে যাচ্ছে 'বারবধূ', 'আসামী হাজির', মিস শেফালি কিংবা সারকারিনায় 'লাজ রাখো' নাটকের চল। আকাদেমি-কেন্দ্রিক গ্রুপ থিয়েটার সম্পূর্ণ তার প্রতিস্পর্ধী হয়ে থাকছে। উৎপল-অজিতেশের প্রভাব ক্রমশ কমছে সে থিয়েটারে। সাতাত্তরে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতিমনস্ক সরকার ওই ব্যবসায়ী থিয়েটারের বিরোধিতা করছেন এবং কিছু নতুন হল বানাচ্ছেন, অধিগ্রহণ করছেন স্টার বা মিনার্ভা থিয়েটার। নাট্যদলের সংখ্যায় বিপুল বিস্ফার ঘটছে, আটের দশকে সরকার নাট্য আকাদেমি তৈরি করছেন। ফলত, নাট্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সাত দশকে 'পি এল টি' – 'নান্দীকার' এবং নতুন 'বহুরূপী' সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদলগুলির অবস্থান নিয়ে আমরা সমীক্ষা চালিয়েছি।

এই সময়টাকেই আমরা আগের অধ্যায়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' বলে চিহ্নিত করেছি। ক্রমে আন্দোলন কথাটির জায়গা নিল অনুদান এবং সরকারি নানা ছাড়। এই থিয়েটার যেমন নতুন নতুন নাট্যকার ও গুণী কলাকুশলীদের জায়গা করে দিয়েছে, তেমনি রুচিশীল দর্শকমণ্ডলী তৈরি করেছে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের থিয়েটারে আগ্রহী করে তুলেছে। প্রধানত পরিচালকের মাধ্যম হয়ে উঠছে গ্রুপ থিয়েটার। ফলত পুরোনো পেশাদার মঞ্চের 'অ্যাক্টর-ম্যানেজার' প্রথা থেকে মুক্তি পাচ্ছে গ্রুপ থিয়েটার। এর মোটো হয়ে দাঁড়াচ্ছে- 'শত ফুল বিকশিত হোক'। মতাদর্শ ভিত্তিক বাংলা থিয়েটারের যে আলোচনা এই অভিসন্দর্ভের আলোচ্য, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নানা দল যে নাট্যপ্রযোজনাগুলি করেছে, তাদের মধ্য থেকে সমালোচনার ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা নিয়ে এই অধ্যায়ের বাকি আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি জরুরি বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছি। শম্ভু মিত্র বহুরূপীতে নেই, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নান্দীকারের বাইরে। অথচ একদা বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্যোগে ১৯৭২-৭৩-এ সমবেত অভিনয় হয়েছিল

বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’, চাণক্যের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র, নির্দেশনা এবং চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাত্যায়ন কুমার রায় রাক্ষস রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কিন্তু ১৯৭৯ সালের শুরুতেই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পুনরায় ‘মুদ্রারাক্ষস’ করেন নান্দীকারের ব্যানারে, চাণক্য সেই শম্ভু মিত্র। ম্যাগসাইসাই পুরষ্কার পাবার পর তাঁর খুব খ্যাতি সেইসময়, মাত্র কয়েক মাস আগে ১৬ জুন ১৯৭৮-এ তিনি ‘বহুরূপী’তে শেষ অভিনয় করেছেন ‘দশচক্র’, তার পরেই ‘মুদ্রারাক্ষস’। একই প্রযোজনায় অন্য নির্দেশকের নাম থাকায় তাঁর আপত্তি হল না। এরই সম্প্রসারণে এই দশকের শেষে নতুন শতকের শুরুতে তাঁর অতিবিতর্কিত গালিলেওর জীবন=এর অভিনয় দিয়ে এই অধ্যায় শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি নবনাট্য প্রসঙ্গে শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামল ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ মতামত।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা নিশ্চয়ই এমন কোনো সহজ এবং সরল সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি না যে ওই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ‘মতাদর্শ’-এর থিয়েটার বা ‘নবনাট্য আন্দোলন’-এর সমাপ্তি ঘটে গেল। কিন্তু এই ইতিহাস নিঃসন্দেহে মতাদর্শের থিয়েটারের তুলনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক পেশাদারিত্বের প্রবণতাকে অনেক বেশিই নির্দেশ করে। এই প্রবণতা আরো প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরকালে। পরবর্তী সময়ে এই ধারার ব্রাত্য বসু সুমন মুখোপাধ্যায় কৌশিক সেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই এই ভাড়া করা অভিনেতা ব্যবহার করেন, প্রযোজনাকে সফল রূপ দেন এবং ক্রমশ প্রায় সর্বত্র গ্রুপ থিয়েটার নাম্নী কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যদলগুলির এইটিই ধরণ হয়ে ওঠে। ফলত শূন্য দশকের থিয়েটারে আমরা সিনেমা সিরিয়ালের মতো থিয়েটারেও প্রচুর সংখ্যক ‘ফ্রি লান্স’ পেশাদার নামধারী নট নটী দেখতে পাব—বলা বাহুল্য যোগ্যতা এবং দায়বদ্ধতার বিচারে অনেকেই এর উপযুক্ত নন। অবশ্য এই বিচার কতটা সমীচীন হচ্ছে তার আলোচনাক্ষেত্র আলাদা, আমরা কেবল

বলতে চাইছি, এই আধা পেশাদার, আধা কমিটেড থিয়েটারে ছয় ও সাত-আটের দশকের ধারাবাহিকতা থাকবার সম্ভাবনা কমে যায়। এদিকে শহর কলকাতায় নতুন কিছু দলের যেমন জন্ম হচ্ছে যেমন 'গণকৃষ্টি', 'লোককৃষ্টি', 'সংসৃতি', 'কসবা অর্ঘ্য', 'দৃশ্যপট', 'রঙ্গপট' ইত্যাদি, তেমনই দল ভেঙে দলের সংখ্যাও বাড়ছে—যেমন 'বহুরূপী' ভেঙে 'চেনামুখ' (১৯৮১), 'পঞ্চম বৈদিক' (১৯৮৫), 'নান্দীকার' ভেঙে 'নান্দীমুখ' (১৯৭৭), 'নান্দীপট' (১৯৭৮), 'শূদ্রক' ভেঙে 'সংস্তব', 'গন্ধর্ব' থেকে 'নক্ষত্র', 'থিয়েটার ওয়র্কশপ' ভেঙে 'অন্য থিয়েটার' বা 'রঙ্গলোক' ইত্যাদি। প্রচুর নাটকের দল, প্রচুর প্রচুর নাটক, নাট্যকর্মী—কিন্তু সেই অনুপাতে প্রেক্ষাগৃহ এবং দর্শক নেই। সরকার এগিয়ে আসছেন হল তৈরিতে, গড়ে উঠছে শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, জেলায় জেলায় রবীন্দ্র সদন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭-তে সরকার গড়ে তুলছেন পশ্চিমববঙ্গ নাট্য আকাদেমি। এই সর্বাত্মক সহযোগিতা কতটা নাট্যশিল্প ও শিল্পীর স্বার্থে আর কতটা দলীয় সমর্থক বৃদ্ধির প্রয়োজনে, সে বিচার করবেন আগামী দিনের গবেষক। সামগ্রিকভাবে বলতে পারি, নতুন শতাব্দীর থিয়েটার অনেক বেশি আঙ্গিকের আধুনিকতায় ভর করে চলে, থিয়েটারের রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা তার বিষয়গত দিকগুলি নিয়ে ততটা ভাবে না। সম্ভবত দৃশ্যগত অভিঘাত বেড়ে যাবার কারণে চটজলদি একধরণের সমালোচনা, প্রশংসা বা নিন্দা সামাজিক মাধ্যমে আজকাল খুবই দেখা যায়, কিন্তু নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে সেগুলির স্থায়ী কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না। নাট্য সমালোচনা বিষয়টাও এই সময়ে কিছুটা অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কিনা সেটাও ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিগত এক যুগে অন্তত *আনন্দবাজার পত্রিকা* ও তার অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়াতে নাট্য সমালোচনার জন্য তেমন জায়গা বরাদ্দ নেই, ব্যতিক্রম *দ্য টেলিগ্রাফ* এবং *দেশ* পত্রিকা। *আজকাল* পত্রিকাতেও অবশ্য মধ্যে মধ্যে নাটকের সমালোচনা বেরোয়।

আমরা আশা রাখব, বর্তমান অভিসন্দর্ভে যে দিকগুলিতে বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হল না, অথবা গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর দুই দশক পেরিয়ে তৃতীয় যে দশকের দিকে বাংলা থিয়েটারের অভিযাত্রা চলেছে, তা নিয়ে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এবং আলোচনা হবে ভবিষ্যতের গবেষকের চেষ্টায়। থিয়েটার প্রতি সন্ধ্যায় জন্মায় প্রতি সন্ধায় তার মৃত্যু হয়। একমাত্র উপযুক্ত সংরক্ষণ-সমালোচনাই পারে কালের হাতে তার গুণাগুণ বিচারের ভার তুলে দিতে।